প্রবন্ধ

রবীন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী প্রথমবার শান্তিনিকেতনে

সৈয়দ আবুল মকসুদ

মোহন দাশ করমচাঁদ গান্ধী ও তার তাঁর পত্নী কস্তুরবা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যে জাহাজে স্বদেশের উদ্দেশে রওনা দেন তা মুম্বাই পৌঁছে ৯ জানুয়ারি ১৯১৫। মহাত্মা গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'দশ বছর পরবাসে কাটিয়ে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন যে কি আনন্দের!' দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাঁর মুম্বাই আসা 'একটি ঘটনা বটে।' মাঝে কয়েকবার অল্প সময়ের জন্যে এলেও ২৮ বছর তিনি ছিলেন দেশের বাইরে। এবার স্থায়ীভাবে দেশে আসার আগে তিনি কিছুদিন লন্ডনে কাটান। দীর্ঘকাল পরে দেশে এসে তিনি রাজকোট ও পোরবন্দর যান তাঁর নিকটাত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অযথা সময় নষ্ট করার মানুষ তিনি নন। তাই অবিলম্বে উপনিবেশিত জাতির নিপীড়িত মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্যে কাজ শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই তিনি তাঁর জীবনের গতি ও লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছিলেন : নিপীড়িত মানুষের মুক্তি। সেখানে তিনি তাঁর 'সত্যাগ্রহ' বা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচি পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যাচারিত অশ্বেতাঙ্গদের পক্ষে সংখ্যালঘু বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরোজিনী নাইডুর ভাষায়-৪৬ বছর বয়স্ক এই আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী এবার যখন দেশে ফেরেন তখন ছিল তাঁর 'একটি সুস্পষ্ট জীবন-দর্শন ও রাজনৈতিক কৌশল যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে'।

আগাম সংবাদ নিয়েই তিনি এসেছিলেন তাই তাঁর সহযোগী রাজনীতিক ও সামাজিক নেতারা তাঁকে মুম্বাইতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তবে দেশে যে তাঁর এত গুণগ্রাহী ও বন্ধু রয়েছে তা তাঁর জানা ছিল না। সেই গুণগ্রাহীদের একজন ব্যারিস্টার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ : তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মুম্বাইস্থ 'গুজরাট সমিতি' গান্ধী ও তাঁর পত্নীকে একটি 'জমকালো সংবর্ধনা' জানায়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বন্দরনগরীর বিখ্যাত আইনজীবী জিন্নাহ, তিনি নিজেও একজন গুজরাটি। তিনি তাঁর ভাষণে 'মিস্টার ও মিসেস গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার যে অতুলনীয় জনসেবামূলক কাজ করেছেন তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।' সংবর্ধনায় বন্দরনগরীর প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর মানবতাবাদী কাজ ও জনসেবার প্রশংসা করে গান্ধীকে একটি মানপত্রও দেওয়া হয়।

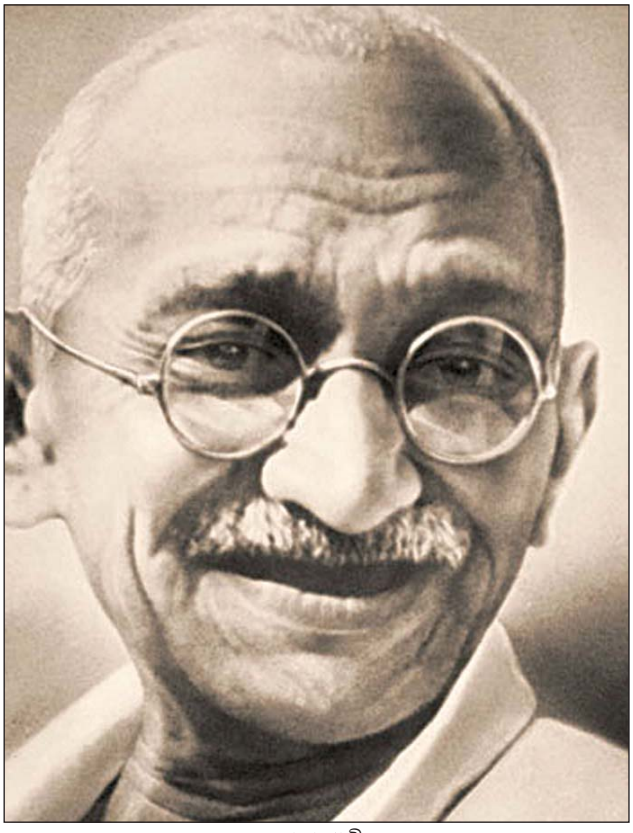

মহাত্মা গান্ধী

মানপত্রের প্রত্যুত্তরে গান্ধী বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবদানের কথা চিরকাল তাঁর অন্তরে গাঁথা থাকবে। এখন তিনি দেশে ফিরে এসেছেন এই ইচ্ছা নিয়ে যে ভারতীয়দের সমস্যা পর্যালোচনা করে তা দূর করতে তিনি সর্বান্তকরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। স্বদেশে

সমস্যার মধ্যে একটি তার চোখে পড়ে তা হলো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমস্যা। অভিন্ন শত্রু বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে এই দুই গোত্রের ঐক্যের বিকল্প নেই। তিনি স্যার সৈয়দ আহমদকে সমর্থন করে বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান ভারতমাতার দুটি চক্ষুর মতো, তার একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। তিনি তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য কাজ করে যাব। পৃথিবীর মানুষ জানে, আমৃত্যু তিনি তাঁর অঙ্গীকারে অবিচল ছিলেন।

ফিনিক্স বিদ্যালয় নামে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। গান্ধী দম্পতি স্থায়ীভাবে ভারতে পৌঁছার আগেই ফিনিক্স বিদ্যালয়ের জনা কুড়ি ছাত্র-শিক্ষককে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভারতে তারা কিছুদিন হরিদ্বার গুরুকূলে থাকেন, তারপর ইংরেজ মিশনারি ও গান্ধীর বন্ধু চার্লস এফ এন্ডরুজের মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথের সম্মতি নিয়ে তাঁদের ১৯১৪-এর নভেম্বরের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হয়। ফিনিক্স বিদ্যালয় ছিল একটি পরীক্ষামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীদের কৃচ্ছ্রতাসাধনে তালিম দেওয় হতো। তাদের কঠোর নিয়মানুবর্তী হতেও শিক্ষা দেওয়া হতো। 'এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কোনো বিশেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হইত না; কঠিন কায়িক পরিশ্রমের সহিত ধর্ম ও নীতি শিক্ষা এবং সাধারণ পাঠ্যাভ্যাস ছিল আবশ্যিক। গান্ধীজির পুত্রেরাও ইহার ছাত্র।'

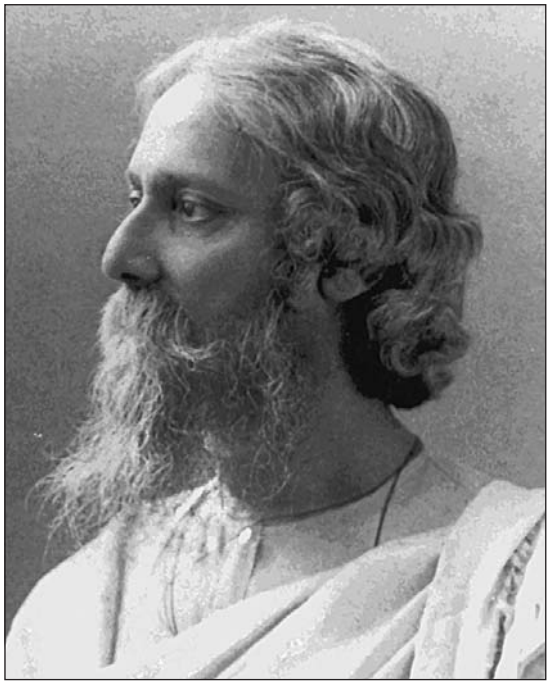

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তবে ট্রান্সভালে গান্ধীর কর্মকান্ড সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অবগত ছিলেন তা ১৯০৮-এর ফেব্রুয়ারিতে 'মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা থেকে জানা যায়। ১৯১২ সালে এন্ডরুজকে লেখা একটি চিঠিতেও তিনি গান্ধীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পর্ক ও মৈত্রী স্থাপনে এন্ডরুজ প্রধান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন, তবে বিশেষ উপলক্ষ হলো ফিনিক্স বিদ্যালয়। ফিনিক্স বিদ্যালয়কে শান্তিনিকেতনে আনার ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সম্মত করান। কবি তাঁর সানন্দ সম্মতির কথা আগেই গান্ধীকেও এক পত্রে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কবি লিখেছিলেন :

That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India, has given me real pleasure- and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their say in Santiniketan fruitful.

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি তখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করছিলেন, লিখেছেন, 'গান্ধীজীর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পঠনপাঠন শিক্ষাশাসন আহার-বিহার, ধরন-ধারণ সবই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের হইতে পৃথক এবং সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই তাহারা এখানে থাকে। ... এই বিদ্যার্থীরা ও শিক্ষকগণ আশ্রমে নতুন প্রাণ উদ্রিক্ত করিলেন।'

[রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪৯৯]

ফিনিক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যাননি, তারা তাদের মতো আলাদাই থাকতেন। ছাত্রদের মধ্যে কোনো বাঙালি ছিল না, গুজরাটি ও তামিলই ছিল বেশি। শিক্ষকদের একজন ছিলেন গুজরাটি মগনলাল গান্ধী।

ফিনিক্সের ছাত্র-শিক্ষকরা যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দার্জিলিং-এ। সেখান থেকে ফিরে তিনি তাদের কঠোর শৃঙ্খলায় বাধা জীবনযাপনের ধরন দেখে যে খুব খুশি হয়েছিলেন তা নয়। কবির মনোভাব বোঝা যায় এন্ডরুজকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে :

They have disciplines, where they should have ideals. They are trained to obey which is bad for a human being; for obedience is good, not because it is good in itself, but because it is a sacrifice, these boys are in danger of forgetting to which for anything, and writing is the best part of attainment. However, they are happy, thought they have no business to be happy.

মানবচরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিলো গান্ধীর চেয়ে বেশি বাস্তববাদী, গান্ধী ছিলেন অতি আদর্শবাদী। অতিরিক্ত আদর্শবাদ অনুসরণ করা মানুষের মূল স্বভাব নয় তাতে কবির কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু গান্ধী জোর দিয়েছেন আদর্শের উপরেই।

গান্ধী যদিও তখন খ্যাতিমান কিন্তু দেশের শীর্ষ নেতা নন, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সেবামূলক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কাজের জন্য শিক্ষিতসমাজে শ্রদ্ধার স্থান করে নিয়েছেন, তবু যেদিন প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন সে দিন তাঁকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে একটা বড় রকম সাড়া পড়ে যায়। তিনি আগেই টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন যে, ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি বোলপুর স্টেশন পৌঁছবেন। তাঁর আগমন সংবাদ শোনামাত্র তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছাত্র-শিক্ষকরা ব্যাপক আয়োজন করেন। তাঁর ভাষায়, 'সেখানকার অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা আমাকে ভালোবাসায় অভিসিক্ত করিলেন। অভ্যর্থনার পদ্ধতিতে আড়ম্বরশূন্যতা, কলা-কৌশল ও ভালবাসা মিশ্রিত ছিল।' এখানে আসার আগে তিনি ধারণাও করতে পারেননি যে তাঁর জন্যে এতোটা আন্তরিক ও ব্যাপক আয়োজন করা হতে পারে। বর্ধমান স্টেশন থেকে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে আগেই চলে যান। প্রত্যক্ষদর্শী একজন লিখেছেন, 'আশ্রমের ছাত্রদল অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে, তাঁহার অভ্যর্থনা যাহাতে সুচারুরূপে ও ভারতীয় রীত্যনুসারে হয়, তাহার আয়োজন করিতে লাগিল। অভ্যর্থনা পূর্বদিন রাত সাড়ে ১২টা ও তৎপূর্ব দিন সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ছেলেরা অভ্যর্থনার আয়োজন করিবার জন্য শ্রম করিয়াছে।'

কবি সে দিন কলকাতায়। গান্ধীর আসার কথা শুনেও কেন তিনি শান্তিনিকেতনে রইলেন না, তা নিয়ে কোনো কোনো লেখক প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের ধারণা রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই তাঁকে এড়িয়ে গেছেন। সত্যিই যে তিনি তা করেছেন তার কোনো প্রমাণ নেই। কবির অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুমোদন নিয়েই শিক্ষকরা আয়োজনের কোনো ত্রুটি করেননি। গান্ধীঅনুরাগী এন্ডরুজ ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার বর্ধমানে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। ছাত্ররা